হাদীস ও সুন্নাহয়
নামাযের পদ্ধতি
ইমাম আবু হানিফা রহ. হাদীস থেকে
যেভাবে নামায আহরণ করেছেন
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

হাদীস ও সুন্নাহ্‌য়

নামাযের পদ্ধতি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
প্রধান, শিক্ষা বিভাগ ও উলূমুল হাদীস অনুষদ
মারকাযুদ দাওয়াহ্ আল ইসলামিয়া, ঢাকা
৩০/১২ পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

আল আবরার ট্রাস্ট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

হাদীস ও সুন্নাহর

নামাযের পদ্ধতি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
আল আবরার ট্রাষ্ট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
শাবান ১৪২৮ হিজরী
আগস্ট ২০০৭ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স : সাইদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এ উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়ার আগমন ও ক্ষমতা দখলের পর তারা সবচেয়ে বেশী বাধাগ্রস্ত হয় এ উপমহাদেশের মুসলমান কর্তৃক। ফলে তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই অস্তিত্ব লাভ করে 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় তাদের জন্মের পরক্ষন হতেই এদেশের প্রায় শতভাগ মুসলমান যারা শত-সহস্র বৎসর যাবত ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিক্‌হের অনুসরণ করে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল অবিচল থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করে আসছে এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে সমগ্র বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতীর উজ্জল নমুনা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

তাদের এ সকল অপতৎপরতার মধ্য হতে একটি হলো এ অপপ্রচার চালানো যে, 'হানাফী ফিক্‌হে' বর্ণিত নামায হাদীস ও সুন্নাহ মোতাবেক নয়! তাদের এই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের জবাব আমাদের উলামায়ে কেরাম ভদ্রোজনোচিতভাবে সব সময়েই দিয়ে আসছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য তারা বিভিন্ন ময়দানে বিভিন্ন সময় লজ্জাজনক অবস্থার শিকার হয়েও এখনো এ সকল অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইদানিং বিভিন্ন সেবা সংস্থার পেট্রো ডলারের জোরে তাদের বাড়াবাড়ী সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখনো যদি তাদেরকে প্রতিরোধ করা না হয় তাহলে এটা মারাত্মক ফিতনা হয়ে দেশ, জাতী ও ধর্মের জন্য মারাত্মক হুকমী হয়ে দাড়াবে। তাছাড়া এদের প্রায় সকল অপতৎপরতা মুসলমান নামাযী ও

ধার্মিক শ্রেনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য। নামাযী লোকদেরকে তারা বিভিন্ন কথা বলে সন্দিহান করে তুলে। কিন্তু বেনামাযী ও ধর্মবিমুখ লোকদেরকে দ্বীনদার বানানোর তেমন কোন চেষ্টাই এদের নেই।

আল্লাহ্ তায়ালা উত্তম বিনিময় দান করুন মারকাযুদ দাওয়াহ্ আল ইসলামিয়া-এর আমীনুত তালীম ও উচ্চতর উলূমুল হাদীস অনুষদ-এর প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেবকে। তিনি উম্মতের এ ক্রান্তি লগ্নে এগিয়ে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি 'হানাফী ফিক্হে' বর্ণিত নামায-এর প্রতিটি অংশই যে হাদীস এবং সুন্নাহ থেকে আহরিত এ কথা সুস্পষ্টভাবে এ রচনায় প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ পাক তাকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ ও তাবিলাহ দান করুন। আমীন!

আমরা সমাজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তাঁর এ প্রবন্ধকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার প্রয়াস পেলাম। আল্লাহ পাক একে কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

৪ঠা শাবান ১৪২৮ হিজরী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ আল আবরার ট্রাষ্ট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকের ভূমিকা

বর্তমানে মুসলিম সমাজ বহিরাগত হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। উপরন্তু গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় একটি মহলের পক্ষ থেকে মুসলিম সমাজের অবশিষ্ট শক্তি ও একতাকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য এবং মুসলমানদেরকে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য নানামুখী প্রচার প্রোপাগান্ডাও জোরেসোরে আরম্ভ হয়েছে। এসবের মধ্যে অতি ভয়ংকর একটি প্রোপাগান্ডা হল, হানাফী ফিকহের কিতাবে নামাযের যে নিয়ম-পদ্ধতি ও বিবরণ পেশ করা হয়েছে এবং যে নিয়ম অনুসারে হাজার বছর যাবৎ লক্ষ কোটি মুসলমান নামায আদায় করে আসছেন, তা নাকি হাদীসের খেলাফ! এর ভিত্তি নাকি যয়ীফ হাদীস বা কিয়াসের উপর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায নাকি এমন ছিল না! তাদের বক্তব্য হল, তারা যে নিয়মে নামায পড়ে থাকে একমাত্র তা-ই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায।

আরো পরিতাপের ব্যাপার হল, এসব ফেতনা সৃষ্টিকারী লোকদের সাথে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদেরও সুর মিলাতে দেখা যাচ্ছে, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ব্যাপারে সজাগ ও যুগ সচেতন বলে দাবি করে থাকে। এরা নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী মরহুমের কিতাব– যার নামটিও সহীহ রাখা সম্ভব হয়নি– দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বলে থাকেন, 'নববী নিয়ম অনুসারে নামায পড়তে হলে এই কিতাবে উল্লেখিত নিয়ম মতো নামায পড়ুন।' এমনকি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ইসলামী অনুষ্ঠানগুলোতেও তা প্রদর্শন করার কথা শোনা যায়।

আলবানী মরহুমের কিতাবটির পর্যালোচনা এবং শরীয়তের দলীলসমূহের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি নির্ভরযোগ্য বই অচিরেই মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়ার রচনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আপাতত এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি আল কাউসারের পাঠকমণ্ডলীর খেদমতে পেশ করা হল[১]। মনোযোগের সাথে প্রবন্ধটি পড়া হলে আশা করি ঐসব বন্ধুদের প্রশান্তি অর্জিত হবে যারা উল্লেখিত মহলের প্রোপাগান্ডার কারণে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আছেন। পাশাপাশি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়টিও অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, কুরআন এক ও রাসূল এক হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে একাধিক মত কীভাবে সৃষ্টি হল এবং ফিকহের একাধিক মাযহাব কীভাবে হল?

আশা করি প্রবন্ধটি ইনসাফের সাথে আমলের নিয়তে পড়া হবে এবং গাফলত বা না জানার কারণে আমাদের নামাযে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে তা শোধরানোর নিয়তে পড়া হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন। আমীন- সম্পাদক, মাসিক আল কাউসার

---

১. সমাজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে লেখকের পুনঃসম্পাদনার পর "আল আবরার ট্রাস্ট" এর থেকে এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো। –সম্পাদক

লেখকের ভূমিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায আদায় করেছেন?

নামাযের গুরুত্ব

নামায প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর আনীত শরীয়তে তাওহীদ ও একত্ববাদের পরেই নামাযের স্থান। তাওহীদের পরে নামাযের মাধ্যমেই তাঁর দাওয়াতের সূচনা হত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯ (১৯)

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর সর্বশেষ ওসীয়ত ছিল নামায সম্পর্কেই। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/২০৬-২০৭)

তিনি বলতেন–

جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلَاةِ

'নামাযের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা বিদ্যমান।

(মুসনাদে আহমাদ ৩/১২৮, হাদীস-১২২৯৩, ১২২৯৪)

কখনো তিনি হযরত বেলাল (রাযি.) কে বলতেন–

قُمْ يَابِلَال! فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ

হে বেলাল! দাঁড়াও, (আযান দিয়ে) নামাযের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও।"

(মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৬৪, হাদীস-২২৫৭৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৮৫,৪৯৮৬)

যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের নামাযসংক্রান্ত দিকটিতে একবারও নজর বুলিয়েছেন তিনিও বুঝতে পারবেন, নামাযের সাথে নবীজীর যে গভীর প্রেমের বাঁধন ছিল তা উপরোক্ত বর্ণনা দুটিও প্রকাশ করতে অক্ষম।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে দুটি কথা :

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায-সম্পাদন পদ্ধতি মূলত কোন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়; এর জন্য কয়েকখণ্ডের বিশাল কলেবর বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজন। যেসব উৎস থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য আহরণ করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ ঃ

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. নামাযসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযবিষয়ক নির্দেশনাসমূহের যে অংশ আমলে মুতাওয়ারাস তথা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে পরবর্তীদের নিকটে পৌছেছে।[২]

৫. উম্মাহর ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নামাযবিষয়ক বিধানাবলি, যা নিঃসন্দেহে উপরোক্ত এক বা একাধিক উৎস থেকে উৎসারিত। এ জাতীয় বিধানাবলির উৎস আমাদের জানা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে বা তা কোন বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছতেও পারে বা নাও পৌছতে পারে।

---

[২] . হায়দার হাসান খান টৌংকী, আত্-তাআমুল; মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী, আল্-ইমাম ইবনু মাযাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান ৮৪-৯০; ইবনু হাযম, আল মিলাল ২/৮১-৮৪; আল-ইহকাম ১/১০৪-১০৯; ইবনু আবদিল বার, আত্-তামহীদ ৮/৬৮-৬৯, ৮৪-৮৫; কাশ্মীরী, নাইলুল ফারক্বাদাইন ১০৪-১০৫, বাসতুল ইয়াদাইন ৫-৯; ইবনুল কায়্যিম ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/২৭৮-২৮২।

৬. সাহাবায়ে কেরামের নামাযবিষয়ক কর্ম ও নির্দেশনা। কেননা, তাঁরা প্রিয়নবীজী থেকে সালাত শিখেছেন এবং পরবর্তী মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন। তাই 'আসারে সাহাবা'ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

উপরোক্ত উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত তথা নামায-সম্পাদন পদ্ধতি ফিকহের ইমামগণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ ফিকহসংক্রান্ত রচনাবলিতে সন্নিবেশিত করেছেন। পাশাপাশি হাদীস ও ফিকহের ইমামগণ এবং উম্মাহর অন্যান্য মনীষী সে সব উৎসসমূহকে অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বক্ষমান প্রবন্ধে নামায বিষয়ক সকল তথ্য একত্রিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয় বা নামায সম্পাদন পদ্ধতির যেসব অংশে নববী রীতির নির্ধারণ বা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে 'খাইরুল কুরূন' থেকে ফিকহের ইমামগণের মধ্যে মত পার্থক্য চলে আসছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কেননা এর জন্য বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন। কোন একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধে সহজ-সরলভাবে (তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত) নামাযের বিবরণ উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। তবে নামাযের যেসব অংশে নববী রীতি নির্ধারণ বা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব,াপারে 'খাইরুল কুরূন' (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগ) থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে সেসবের প্রসিদ্ধ মতটির দিকেও ইঙ্গিত করা হবে।

প্রবন্ধটি প্রস্তুত করতে হাদীস, সীরাত ও 'ফিকহে মুকারানের' গ্রন্থাবলির সরাসরি সাহায্য নেওয়ার পাশাপাশি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহকে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে ঃ

১. জামেউল উসূল, ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬০৬হি.) এতে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তা মালেকের হাদীসসমূহকে একত্রিত করা হয়েছে।

২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭হি.) এতে মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবী ইয়ালা এবং তাবারানীর 'মুজাম' তিনটির সেসব হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে যা 'কুতুবে সিত্তায়' (হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব) নেই।

৩. নাসবুর রায়াহ, যাইলায়ী (মৃত্যু ৭৬২হিজরী)

৪. আততালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২হিজরী)

৫. মুনতাকাল আখবার মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যা (৬৫৩হিজরী)

উপরোক্ত গ্রন্থাবলিতে প্রায় একশ গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সালাত বিষয়ক হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালেহী (মৃত্যু ৯৪২ হিজরী)

৭. যাদুল মায়াদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, ইবনুল কায়্যিম (মৃত্যু ৭৫১ হি.)

উল্লেখ্য এ প্রবন্ধের সব বিষয়েই উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হবে এমন নয় বরং বিশেষ কোনো প্রয়োজন বোধ হলেই হাদীসের মূল কিতাব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কিতাবের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করা হবে।

وَمَا تَوْفِيْقِى اِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

বিনীত

আব্দুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা

নামায আদায়ের নববী-পদ্ধতি

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

"আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার নিয়ত অনুযায়ী আমলের ফলাফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য হিজরত করবে সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া উপার্জন বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে তার হিজরত সে জন্যই সাব্যস্ত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তাই নামাযের সর্বপ্রথম ফরয হল নিয়ত খালেস করা, শুধু আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা।

নিয়ত হল অন্তরের সংকল্প। অর্থাৎ এমন সংকল্প করা যে, আমি ফজরের ফরয বা যোহরের ফরয পড়ছি। এর উচ্চারণ জরুরি নয়। অন্তরের সংকল্প ছাড়া শুধু মুখের উচ্চারণে নিয়ত আদায় হয় না। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা প্রমাণিত নয়। তাই মুখে নিয়ত করাকে সুন্নাত বলা ভুল। তবে অন্তরের সংকল্পের পাশাপাশি মুখের নিয়তের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। কিন্তু আরবী ভাষায় নিয়ত করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা নিতান্তই ভুল এবং প্রচলিত লম্বা আরবী নিয়ত করতে গিয়ে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা জোরে জোরে উচ্চারন করে অন্যের মনোযোগ নষ্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(ইবনে তাইমিয়া, আলফাতাওয়াল কুবরা ১/২৭৭-২৯০, ইবনে নুজাইম, আল্ বাহরুর রায়েক ১/২৭৭)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন তখন الله اكبر বলে নামায শুরু করতেন।

৩. তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন এবং উঠানোর সময় হাতের অঙ্গুলিসমূহ খোলা (ও কেবলামুখী করে) রাখতেন।

(সহীহ মুসলিম ২/২৬৯, ২৯১, হাদীস-৩৯১, ৪০১, জামে তিরমিযী ২/৫, হাদীস-২৩৯)

সহীহ হাদীসে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে এবং তা কোন কোন ইমামের মতে সুন্নাতও বটে। কিন্তু সেই হাদীসের ব্যাখ্যা সম্ভবত হযরত ওয়ায়েল (রাযি.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা হয়ে যায়, যা সুনানে আবু দাউদে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ اَبْصَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

"তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন উভয় হাত এভাবে উঁচু করলেন যে, উভয় হাত কাঁধ বরাবর এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কান বরাবর হয়ে গেল, এরপর তাকবীর দিলেন।" (সুনানে আবু দাউদ ১/৪৮২, হাদীস-৭২৫)

বোঝা গেল শুধু কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো উদ্দেশ্য নয় বরং এভাবে উঠাতে হবে যাতে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত পৌছে যায়। আবার এও হতে পারে যে, কাঁধ পর্যন্ত উঠানোও একটি মাসনূন পদ্ধতি।

৪. তাকবীরের পরে ডান হাত বাম হাতের উপর (অর্থাৎ ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর) রেখে হাত বাঁধতেন। (শাওকানী, নাইলুল আওতার-২/১৮৮)

৫. হাত কোথায় বাঁধতেন তা ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন–

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ اَنَّ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهِ فِى الصَّلَاةِ وَرَاٰى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী আহলে ইলমের কর্মধারা এমনই। অর্থাৎ তাঁরা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাকে নামাযের নিয়ম মনে করতেন। তাঁদের কতক নাভির উপরে এবং কতক নাভির নিচে হাত রাখাকে উত্তম মনে করতেন। তবে উভয় পদ্ধতিই তাঁদের সকলের মতে বৈধ ছিল।" (জামে তিরমিযী ২/৩৩, হাদীস-২৫২- এর আলোচনায়)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমল থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নাভির নিচে হাত বাঁধতেন, কখনো নাভির উপরে। **কিন্তু বুকে হাত বাঁধার কথা কোন সহীহ হাদীসে নেই এবং তা কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়। তাই এই রীতিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বলা ভুল।**

এখন প্রশ্ন হল, নাভির উপরে হাত বাঁধা এবং নাভির নিচে হাত বাঁধা উভয়টিই কি সুন্নাত, না একটি সুন্নাত ও অপরটি মুবাহ? এই প্রশ্নের উত্তরদানের ভার ফিকহের ইমামগণের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর তাদের অনেকেই নাভির নিচে হাত বাঁধাকে সুন্নাত বলেছেন।

৬. তিনি 'কিয়াম' অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতেন। নামাযে এদিক সেদিক তাকাতে বারণ করতেন এবং খুশূখুযূর সাথে নামায আদায় করার আদেশ করতেন। তাঁর নামায সর্বাধিক খুশূখুযূমণ্ডিত হত।

৭. এরপর অনুচ্চস্বরে কোন দুআ বা সানা পড়তেন। সাধারণত ফরয নামাযে নিম্নোক্ত সানা পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ

এ ছাড়া আরো কিছু দুআও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত তাহাজ্জুদ নামাযে পড়তেন।

(ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/১৯৭-১৯৯)

ফরয নামাযে উপরোক্ত সানাটি পড়া খুলাফায়ে রাশেদীনেরও আমল ছিল। (মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া, আল মুনতাকা মিন আখবারিল মুস্তফা ১/৩৭০)

৮. সানার পরে 'তাআওউয' ও 'তাসমিয়াহ' পড়তেন। তাআওউযের প্রসিদ্ধ শব্দ হল–

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬১০; ইবনুল জাযারী, আন নাশর ফিল কিরাআতিল আশর ১/২৪৩)

তাআওউযের আরেকটি শব্দও সহীহ হাদীসে আছে, কিন্তু সেটি তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। 'তাসমিয়াহ'র শব্দ নির্ধারিত। আর তা হলো–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৯. 'আমলে মুতাওয়ারাস' (উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা) দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আউযুবিল্লাহ' অনুচ্চস্বরে পড়তেন।

১০. সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি 'বিসমিল্লাহ'ও অনুচ্চস্বরে পড়তেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনি কখনো কখনো বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়েছেন, কিন্তু এসব বর্ণনা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের আপত্তি রয়েছে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া তাঁর সুন্নাত নয়।

(ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন ৫০-৫১)

১১. এরপর সূরায়ে ফাতেহা পড়তেন।

১২. সূরায়ে ফাতেহা সমাপ্ত হলে 'আমীন' বলতেন।

১৩. 'আমীন' কি উচ্চস্বরে বলতেন, না অনুচ্চস্বরে? আস্তে কেরাআতের নামাযে অনুচ্চস্বরে বলতেন। উম্মাহর কর্মধারা তা-ই প্রমাণ করে। কিন্তু উচ্চস্বরে কেরাআতের নামাযে তাঁর আমল কী ছিল– এর ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের। সহীহ্ হাদীসে উভয়টিই পাওয়া যায়,তবে বিভিন্ন আলামত ও লক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্চস্বরে বলাই তাঁর মূলরীতি ছিল; তবে আমীন বলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো কখনো উচ্চস্বরেও বলেছেন। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৬৬, 'কুনুত ফিল ফজর' এর আলোচনায়)

ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রহ.) লেখেন–

وَالصَّوَابُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ بِالْجَهْرِ بِهَا وَالْمُخَافَتَةِ صَحِيْحَانِ وَعَمِلَ بِكُلٍّ مِّنْ فِعْلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كُنْتُ مُخْتَارًا خَفْضَ الصَّوْتِ بِهَا إِذْ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَلٰى ذٰلِكَ.

"সঠিক কথা হল, উচ্চস্বর ও অনুচ্চস্বর উভয় ধরনের হাদীসই সহীহ এবং তাঁর প্রত্যেক কর্মই একদল আলেমের মাধ্যমে অনুসৃত হয়েছে, যদিও আমার নিকট অনুচ্চস্বরে বলাই বেশী পছন্দনীয়। কেননা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল এরূপই ছিল। (তাহযীবুল আসার, আলজাওহারুন নাকী ফির-রাদ্দি আলাল বায়হাকী ২/৫৮)

১৪.সূরায়ে ফাতেহার পরে অন্য কোন সূরা পড়তেন। তবে ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে ফাতেহার পরে কোন সূরা পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৩৯)

১৫. কেরাআত তারতীলের সাথে পরিষ্কার করে পড়তেন।

১৬. কখনো অনেক দীর্ঘ কেরআত পড়তেন এবং কখনো সফর ইত্যাদির কারণে অতি সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়তেন। সাধারণত মাঝারি ধরনের কেরাআত পড়তেন। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০২)

হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাযি.)–এর বর্ণনা মতে ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশ আয়াত পড়তেন। হযরত জাবের ইবনে সামুরা

(রাযি.) বলেন, নবীজী ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ' এবং এ জাতীয় সূরা পড়তেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৫৮ (১৬৯); মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২০৩৩২)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণত ফজরের নামাযে 'তিওয়ালে মুফাসসাল'– এর সূরাসমূহ পড়তেন।

যোহরের নামাযে কখনো দীর্ঘ কেরাআত পড়তেন এবং কখনো সূরা 'আ'লা' ও সূরা 'গাশিয়া' (বা এই পরিমাণ) পড়তেন। কোন কোন সহীহ হাদীসে দুই রাকাআতে সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাজদা' এর সমপরিমাণ (যা ত্রিশ আয়াতসম্বলিত) পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

আসরের কেরাআত যোহরের কেরাআতের প্রায় অর্ধেক হত (যদি যোহরের কেরাআতকে দীর্ঘ ধরা হয়) বা তার সমান হত (যদি যোহরের কেরাআত মাঝারি ধরা হয়)। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০৩)

মাগরিবের নামাযে 'কিসারে মুফাসসাল'– এর সূরাসমূহ পড়তেন, তবে সর্বদা এমন করতেন না। কেননা মাগরিবের নামাযে বড় সূরা যথা ঃ সূরা সফফাত, হা-মীম দুখান, মুরসালাত ও আ'লা ইত্যাদি পড়াও বর্ণিত আছে। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০৩-২০৫, আযযাইলায়ী, নাসবুর রায়া ২/৫-৬)

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইশার নামাযে 'আওসাতে মুফাসসাল' এর সূরাসমূহ পড়তেন। একবার হযরত মু'আজ (রাযি.) ইশার নামাযে অনেক দীর্ঘ কেরাআত পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যখন ইমামত করবে তখন–

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى - وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا-

ইত্যাদি সূরা পড়বে। কেননা তোমার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, কোন প্রয়োজনে গমনকারী ব্যক্তিরাও নামায পড়ে থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০১-৭০৫, সহীহ মুসলিম ২/৩৭৮, ৩৮১, হাদীস ৪৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪৩০৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৯৯৭-৯৯৮)

জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও সুরা 'দাহর' পড়তেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস- ৮৯৯১; সহীহ মুসলিম হাদীস-৮৮০)

জুমুআর নামাযে কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'জুমু'আ' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'মুনাফিকূন' এবং কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'গাশিয়া' পড়তেন।

দুই ঈদের নামাযে কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'আ'লা' ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'গাশিয়া' পড়তেন এবং কখনো সূরা 'কাফ' ও সূরা 'কামার' পড়তেন।

তবে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নামাযের কেরাআত উল্লেখিত সূরাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন 'মুফাসসালের' ছোট বড় কোন সূরা এমন নেই যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফরয নামাযে পড়তে শুনিনি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-৮১৪)

বরং মুফাসসালের বাইরে কুরআনে কারীমের অন্যত্র থেকে পড়াও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামগণকে বিশেষভাবে মুকতাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশ করতেন। তিনি ইরশাদ করেন–

اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ، وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ.

"যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের ইমামত করবে তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকে এবং যখন সে একাকী নামায পড়বে তখন যে পরিমাণ দীর্ঘ করতে চায় করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৭০৩, সহীহ মুসলিম ২/৩৮৩-৩৮৪, হাদীস ৪৬৮)

একবার কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট অভিযোগ করল যে, অমুক ইমাম খুব দীর্ঘ কেরাআত পড়েন, যার কারণে আমি হয়ত জামাআতে শরীক হতে পারব না। নবীজী তা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন–

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ! اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ مِنْ وَرَاءِهِ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ (وَالْمَرِيْضَ)

"হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি এমন আছে, যারা মানুষের আগ্রহ নষ্টকারী। তোমাদের কেউ যখন ইমামত করবে তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, প্রয়োজনে গমনকারী (ও অসুস্থ) ব্যক্তি থাকে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস-৯০, সহীহ মুসলিম ২/৩৮২, হাদীস ৪৬৬)

১৮. তিনি ইমামের পেছনে ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়ার আদেশ কখনো করেননি। (ইবনে তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/৩১৫,৩২০)

তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত হবে।[৩]

আরও বলেছেন–

اِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ، ثُمَّ يَؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَاِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.....

"যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াও তখন কাতার সোজা কর। এরপর তোমাদের একজন ইমাম হও। যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল; যখন সে কেরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক; যখন সে

---

[৩] হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ। (ইবনে তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/২৭১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৬৮ হাদীস ৫০০।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ তোমাদের দুআ কবুল করবেন।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪০৪, সহীহ আবি আওয়ানা ২/১৩২-১৩৩)

কোন কোন বর্ণনায় অনুচ্চস্বরে কেরাআতের নামাযে ফাতেহা পড়ার শুধু অনুমতি বর্ণিত হয়েছে।

তবে সে সব বর্ণনার ব্যাপারে অনেক হাদীস বিশারদের আপত্তি রয়েছে।

(ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৩৪০; কাশ্মীরী, ফাসলুল খিতাব ফী ফাতিহাতিল কিতাব)

১৯. ফজরের উভয় রাকাআত, মাগরিব, ইশার প্রথম দুই রাকাআত, জুমুআ, দুই ঈদ, ইস্তিসকা ও সূর্যগ্রহণের নামাযে তিনি উচ্চস্বরে কেরাআত পড়তেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুচ্চস্বরে পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাযে সাধারণত কিছুটা উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

২০. ফজরের নামাযে সাধারণত প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন (যাতে মুকতাদীরা পুরো জামাআত পায়) এবং যোহর আসরেও এমন করতেন। তবে যোহর আসরের উভয় রাকাআতের কেরাআত সমান হওয়ার কথাও সহীহ হাদীসে রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৯ ইলাউস সুনান ৪/২৪-২৬))

২১. কেরাআত সমাপ্ত হলে কিছুটা বিরাম নিতেন, (যাতে শ্বাস ফিরে আসে) এরপর তাকবীর দিয়ে রুকূতে যেতেন।

২২. রুকূতে উভয় হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতেন যেন তা ধরে রেখেছেন। অঙ্গুলিসমূহ ফাঁক করে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। মাথা উঁচুও করতেন না, নিচুও করতেন না, বরং পিঠের সমান্তরালে রাখতেন। এত সোজা হত যে, পিঠে পানি ঢেলে দিলে তা স্থির থাকবে। রুকূতে বার বার سبحان ربى العظيم বলতেন। কখনো তিনবার বলতেন। রুকূতে কখনো অন্য ধরনের তাসবীহ ও দুআ পড়তেন।

রুকূ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আদায় করতেন এবং বলতেন–

لَاتُجْزِئُ صَلَاةٌ لَايُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"ঐ নামায যথেষ্ট নয়, যাতে ব্যক্তি রুকূ- সেজদায় আপন মেরুদণ্ড সোজা করে না।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-৮৫৫, জামে তিরমিযি, হাদীস-২৬৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস-৫৯১-৫৯২, ৬৬৬)

আরো ইরশাদ করেছেন–

أَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَايُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا.

"নিকৃষ্টতম চুরি হল নামাযে চুরি করা। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, নামাযে রুকূ- সেজদা পূর্ণাঙ্গভাবে করে না।" (মুসনাদে আহমদ ৫/৩১০, হাদীস-২২১৩৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস-১৮৮৮)

২৩. রুকূ থেকে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতে বলতে উঠতেন ও অত্যন্ত শান্ত ভাবে সোজা হয়ে দাড়াতেন। এরপর رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمْدُ বা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কখনো এর চেয়ে দীর্ঘ তাহমীদও পড়তেন, যথা এক বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দ উল্লেখিত হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَالسَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَالَكَ عَبْدٌ- لَامَانِعَ لِمَاأَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ، وَلَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৭৭)

২৪. 'কওমা' থেকে তাকবীর বলতে বলতে সেজদায় যেতেন। প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, এরপর চেহারা ভূমির উপর রাখতেন। কোন কোন

বর্ণনায় প্রথমে হাত তারপর হাঁটু রাখার কথাও এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তা সহীহ নয়। এ ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্যও রয়েছে।

(ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২১৫-২২৪; হাবিবুর রহমান আযমী (রহ.), মাকালাতে আবুল মাআসির ১/১৪৯-১৭৪)

২৫. সেজদাতে কপাল ও নাক ভালভাবে জমির উপর রাখতেন। চেহারা উভয় হাতের মাঝে এবং উভয় কব্জি কান বরাবর,কখনো কাঁধ বরাবর রাখতেন। উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে এবং কনুই জমি থেকে উঁচু রাখতেন, এমন কি নিচ দিয়ে ছাগলছানা অতিক্রম করতে চাইলে অতিক্রম করতে পারত।

সেজদা সাতটি অঙ্গের উপর ভর দিয়ে করতেন– কপাল এবং নাক, উভয় হাতের পাতা, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের পাতার প্রান্ত। সেজদায় হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখতেন এবং পায়ের অঙ্গুলি কিবলামুখী রাখতেন।

সেজদা অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে আদায় করতেন। এক ব্যক্তিকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে নবীজী বলেন–

اِنَّهَا لَاتَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاأَذِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخٰى، يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَسْتَوِىْ قَائِمًا حَتّٰى يُقِيْمَ صُلْبَهُ فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ، فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخٰى، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِىْ قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدِهِ وَيُقِيْمُ صُلْبَهُ،

"তোমাদের কারো নামায পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে উত্তমরূপে অযূ করবে যেমন আল্লাহ আদেশ করেছেন। এরপর তাকবীর বলবে ও আল্লাহর প্রশংসা করবে (অর্থাৎ সানা পড়বে। এরপর কুরআন থেকে পড়বে, যা আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দিয়েছেন। এরপর তাকবীর বলে রুকূ করবে। রুকূতে উভয় হাতের পাতা হাঁটুর উপর রাখবে, যতক্ষণ না তার

সকল জোড়াসমূহ স্থির হবে। এরপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং মেরুদণ্ড সোজা করবে, যাতে সকল হাড় স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে যায়। এরপর তাকবীর দিয়ে সেজদায় যাবে এবং চেহারা ভালভাবে জমিতে স্থাপন করবে, যতক্ষণ না তার জোড়াসমূহ স্থির হবে। এরপর তাকবীর দিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং মেরুদণ্ড খাড়া করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস- ৮৫৮; সুনানে দারেমী, হাদীস-১৩৩৫)

সেজদায় বারবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়তেন। কখনো শুধু তিনবার পড়তেন। নফল নামাযের সেজদায় দুআও করতেন। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী কখনো ফরয নামাযেও সেজদায় দুআ করতেন।

২৬. তাসবীহ্‌র পরে তাকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে উঠতেন এবং অত্যন্ত শান্ত হয়ে বসতেন। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। ডান পায়ের অঙ্গুলিসমূহ কেবলামুখী করে রাখতেন। ফরয নামাযে এ সময় কী পড়তেন, এ ব্যাপারে আমাদের জানা মতে হাদীসের বর্ণনাসমূহ নিরব। নফল নামাযে নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ (وَارْفَعْنِىْ) وَاهْدِنِىْ (وَعَافِنِىْ) وَارْزُقْنِىْ)

অথবা رَبِّ اغْفِرْلِىْ, رَبِّ اغْفِرْلِىْ পড়তেন।

(সুনানে নাসায়ী, হাদীস-১১৪৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-৮৭৪, সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস-৮৯৭)

সাধারণ রীতি অনুযায়ী মনে হয় যে, ফরয নামাযেও উপরোক্ত দুআ বা এ জাতীয় কোন দুআ পড়তেন। কেননা নামাযের কোন রোকন বা কোন কাজ যিকির শূন্য রাখা তাঁর রীতির বিরোধী কাজ।

২৭. 'জলসা'- এর পরে প্রথম সেজদার মত দ্বিতীয় সেজদা করতেন। এরপর তাকবীর বলতে বলতে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। সেজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে মাথা এরপর হাত এরপর হাঁটু ওঠাতেন। ওঠার সময় জমিতে ভর দিতেন না। উরুর উপর ভর দিয়ে

সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রথম বা তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদার পরে বসতেন না। এটাই তার সাধারণ রীতি ছিল। কোন কোন বর্ণনায় দ্বিতীয় সেজদার পরে বসার কথা উল্লেখ আছে এবং ওঠার সময় (জমিতে) ভর দিয়ে ওঠার কথাও উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু এই বিষয়ক সকল হাদীস ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির সমষ্টিগত বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, তা কখনো ওযরবশত হয়ে থাকবে। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৩২-২৩৪, ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৪৫১; আল বানূরী, মাআরিফুস সুনান ৩/৭৪-৮১))

২৮. রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠে এবং প্রথম বৈঠক থেকে উঠে তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাফয়ে য়াদাইন' করতেন কি না বা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত ওঠাতেন কি না– এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন ধরনের। সারসংক্ষেপ হল, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও 'রাফয়ে য়াদাইন' না করাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের কিছু ক্ষেত্রে বিশেষত রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে উঠতে 'রাফয়ে য়াদাইন' করাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এখন দেখার বিষয় হল, উভয় রীতিই সুন্নাত, না একটি সুন্নাত অপরটি কখনো কখনো বৈধতা বোঝানোর জন্য হত, এর সমাধান দেওয়া ফিকহের ইমামগণের কাজ এবং তাঁরা তা করে গিয়েছেনও।

'রাফয়ে য়াদাইন' না করা সুন্নাত হওয়ার বা এটাই মৌলিক সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় আলামত হল 'খাইরুল কুরূনে' এ অনুযায়ী আমল বেশি ছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত উমর (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.) থেকে তা-ই প্রমাণিত। অপর দুইজন থেকে সহীহ সনদে 'রাফয়ে য়াদাইন' প্রমাণিত নয়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে অধিকাংশ ফকীহগণের আমলও তাই ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে প্রথম কাতারের নিয়মিত মুসুল্লী ছিলেন তাঁদের আমলও তাই ছিল।

কোন কোন ইমাম বিভিন্ন কারণে 'রাফয়ে য়াদাইন' কে সুন্নাত বলেছেন, তবে সকল ইমামের মতে 'রাফয়ে য়াদাইন' করা বা না করা উভয়টিই জায়েয। আলোচনা শুধু উত্তম অনুত্তমের ব্যাপারে। (ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফাহ বাইনাল মুসলিমীন- ৫৫-৫৬; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল

মায়াদ ১/২৬৬, ইবনে দাকীকুল ঈদ, আল ইমাম ফী মারিফাতি আহাদীসিল আহকাম আযযাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ ১/৩৯৩, কাশ্মীরী, নাইলুল ফারকাদাইন, ফী মাসআলাতি রাফয়িল য়াদাইন, বাসতুল য়াদাইন লিনাইলিল ফারকাদান, আল বানুরী, মাআরিফুস সুনান শরহু জামিয়িত তিরমিযী ২/৪৫১-৫০১; উসমানী, ইলাউস সুনান ৩/৫৬-৯১; কাউসারী, আননুকাতুত তরীফাহ (ভূমিকা), আল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা-আহলিল মাদীনা-২৩)

২৯. দ্বিতীয় রাকাআত প্রথম রাকাআতের মতই আদায় করতেন, তবে এর শুরুতে সানা ও তাআওউয পড়তেন না।

৩০. দ্বিতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে তাশাহহুদের (আত্তাহিয়্যাতুর) জন্য বসতেন। এখানেও এভাবেই বসতেন যেভাবে দুই সেজদার মাঝখানে বসতেন।

৩১. তাশাহহুদের প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধতম বর্ণনা হল–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ أَنْ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

৩২. তিন রাকাআত বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে তাশাহহুদের পরে কিছু পড়তেন না। তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।

৩৩. তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাতেন না।

৩৪. তৃতীয় (শেষ রাকাআত হলে) বা চতুর্থ রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে বসতেন।

৩৫. 'আখেরী বৈঠকে' বসার বিভিন্ন পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু যে পদ্ধতিটিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) নামাযের প্রত্যেক বৈঠকের জন্য মাসনূন পন্থা বলেছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়ম বলেছেন তাহল,বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে তার অঙ্গুলিসমুহ কেবলামুখী রাখা। এ থেকে

এবং অন্যান্য আলামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্য পদ্ধতিগুলো বিশেষ অবস্থায় বা কোন উযরবশত হত। (বাদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ৬/১০২-১০৩, কাশ্মীরী, ফয়যুল বারী ২/৩১০-৩১২, বানূরী, মা'আরেফুস সুনান ৩/১৬০-১৬৬)

৩৬. তাশাহহুদের সময় উভয় হাত উরুর উপর রাখতেন। ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বামহাত বাম উরুর উপর রাখতেন। কোন কোন বর্ণনায় উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখার কথা আছে। এর অর্থ হল হাত উরুর সম্মুখভাগে এমনভাবে রাখতেন, যেন অঙ্গুলিসমূহ হাঁটু স্পর্শ করত। কোন কোন বর্ণনায় বাম হাতের পাতা একদম বাম হাঁটুর উপরে রাখার উল্লেখ এসেছে। বলাবাহুল্য এমনটি মাঝে মাঝে করে থাকবেন। (মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ২/৩২৯, শাব্বীর আহমদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম শরহু সহীহি মুসলিম ২/১৬৯))

৩৭. তাশাহহুদের মধ্যে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহ কীভাবে রাখতেন এবং কীভাবে ইশারা করতেন, এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসসমূহে বিভিন্ন তরীকা বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু দুইটি হাদীস উল্লেখ করা হল–

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا، حَلَّقَ بِشْرٌ (الرَّاوِى) الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

'হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে বসার অবস্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। ডান কনুই ডান উরুর সমান্তরালে রাখলেন। দুই অঙ্গুলি গুটালেন ও একটি গোলক বানালেন এবং আমি তাঁকে এভাবে ইশারা করতে দেখেছি, বর্ণনাকারী বিশ্‌র মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলক তৈরী করলেন এবং শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন।"(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-৯৫৭)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তিনি নামাযে বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের পাতা ডান উরুর উপর রাখতেন, সকল অঙ্গুলি গুটিয়ে ফেলতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির কাছের অঙ্গুলিটি দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাতের পাতা বাম উরুর উপর রাখতেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮০, (১৪৪) মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী, মুয়াত্তা ১৮৭)

এখন প্রশ্ন হয় যে, কখন হাতের অঙ্গুলিসমূহ মুঠ করা বা গোলাকার বানানো হবে, বসার শুরু থেকেই, না ইশারার সময়-এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হাদীস শরীফে নেই। ফকীহগণ এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন, যা সংশ্লিষ্ট আলামত ও হাদীসের ইশারা-ইঙ্গিতের উপর নির্ভরশীল :

(১) ইশারার সময় করবে। (ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/২৭২, মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ-২/৩২৮)

(২) বসার শুরু থেকেই করবে। (আব্দুল হাই লাখনোভী, আসসিআয়াহ ২/২২১)

আর ইশারা সবার্বস্থায় কালেমা শাহাদাত পড়ার সময় হবে। এই সিদ্ধান্ত উম্মাহর কর্মধারা ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ইশারার পরে হাতের অঙ্গুলিসমূহ মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বা গোলাকার অবস্থায় বাকি রাখতেন কি না? কোন কোন বর্ণনার কোন কোন শব্দ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ইশারার পরে সালাম পর্যন্ত এই অবস্থা বাকি থাকত। (বানূরী, মাআরিফুস সুনান ৩/১০৬)

বাম হাতের অঙ্গুলিসমূহ কীভাবে রাখতেন, এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, তা বাম উরুর উপর (সম্মুখ অংশে) বিছিয়ে রাখতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮০ (১১৪)

কতক ব্যক্তি মনে করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাহিয়্যাতুর শুরু থেকেই শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়ানো শুরু করতেন এবং

সালাম পর্যন্ত নাড়াতে থাকতেন। এই ধারণা ভুল। এর ভিত্তি একটি দুর্বল বর্ণনা, যা মুনকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ইশারা করতেন, অঙ্গুলি নাড়াতেন না এবং তাও শুধু শাহাদাতের সময়, পুরো আত্তাহিয়্যাতু বা পুরো বৈঠকে নয়। (মাহমুদ সাঈদ মামদূহ, আততারীফ বিআওহামি মান কাসামাস সুনানা ইলা সাহীহিন ওয়া যায়ীফ ৪/১১-১৯, হাদীস-৩৮৫)

শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা প্রথম বৈঠকের তাশাহহুদের মধ্যেও মাসনূন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেও ইশারা করতেন। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস-১১৬১)

৩৮. আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ পড়ার আদেশ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদেরকে নিম্নোক্ত দরূদটি শিখিয়ে দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد،

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৩৭০)

এই দরূদকে দরূদে ইবরাহীমী বলা হয়। সহীহ হাদীসে এর বিভিন্ন শব্দ বর্ণিত হয়েছে। যে কোন শব্দ অবলম্বন করা যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নামাযে এই দরূদ পড়তেন। (ইমাম শাফেয়ী, কিতাবুল উম্ম ১/১৪০, বায়হাকী সুনানে কুবরা-২/১৪৭)

৩৯. দরূদের পরে দুআ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর ইরশাদ হল, হামদ ও সানা অর্থাৎ তাশাহহুদ ও দরূদের পরে যে যা প্রার্থনা করতে চাও বা যে দুআ তোমাদের অধিক পছন্দ হয় তা-ই আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৭৪৬৮; জামে তিরমীযি হাদীস ৩৪৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস-১৯৫১)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এই স্থলে পড়ার জন্য তাকে নিম্নোক্ত দুআটি শিখিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩৪)

এ ছাড়া আরো দুআ বর্ণিত রয়েছে, যা নিজে পড়তেন বা পড়ার নির্দেশ দিতেন। এখানে আরেকটি দুআ উল্লেখ করা হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩২)

৪০. দুআর পরে উভয় দিকে সালাম ফিরাতেন। ডান দিকেও, বাম দিকেও।

সালামের শব্দ হল ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন–

حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

'সালাম বেশি দীর্ঘ না করা সুন্নাত।' (জামে তিরমিযী, হাদীস-২৯৭)

এ থেকে বোঝা যায়, সালাম দীর্ঘ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল না। আজকাল অনেক ইমামকে السلام ও الله শব্দ দুটি অনেক লম্বা করতে শোনা যায়, যা সংশোধনযোগ্য।

৪১. নামায সমাপ্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুআ ও যিকির নিজেও পড়তেন এবং পড়ার নির্দেশও দিতেন এবং বলতেন, রাতের শেষ প্রহরে ও ফরয নামাযের পরে দুআ অধিক কবূল হয়ে থাকে।

(জামে তিরমিযী, হাদীস-৩৪৯৯)

ফরয নামাযের পরে কখনো কখনো হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন।

(আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, সালাসু রাসাইল ফী ইসতিহবাবিদ দুআয়ি বাদাস সালাওয়াতিল মাকতূবাহ, শামসুদ্দীন নূর, আততুহফাতুলমাতলুবাহ ফিসতিহবাবি রাফয়িল য়াদাইন ফিদ দুআ বাদাল মুকতূবাহ।)

কিছু কথা ঃ

১. উপরোক্ত আলোচনায় নামাযের নববী পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়নি। এ জন্য হাদীস ও সীরাতের দীর্ঘ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সাহায্য নিতে হবে।

২. এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় শুধু বিবরণের আঙ্গিকে নামায-পদ্ধতি উপস্থাপিত হয়েছে। ফিকহী আঙ্গিকে প্রত্যেক কাজের শরয়ী মান (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়নি। এর জন্য ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

৩. নামাযের পদ্ধতির যেসব অংশে নববী রীতি নির্ধারণ বা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে 'খাইরুল কুরূন' থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে সেসব বিষয়ে ইঙ্গিতে দুই একটি কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও বিশ্লেষণ ফিকহের ইমামগণ করে গেছেন। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য 'ইলমু মুখতালিফিল হাদীস' 'ইলমু মুশকিলিল হাদীস' 'ফিকহুল খিলাফিয়াত' 'আলফিকহুল মুকারান' এবং হাদীসের প্রাচীন ও বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। এতে এই সব শাখাগত মতানৈক্যের মান ও পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ হবে এবং এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এসব বিষয়কে ঝগড়া-বিবাদ, সমালোচনা ও কটুক্তি বা হাদীস অমান্য করার অভিযোগ দায়ের করার মাধ্যম বানানো ভুল এবং শরীয়তের রুচি-প্রকৃতি পরিপন্থী কাজ।

ইদানীং এই বিষয়টিকে এতই সহজ মনে করা হয় যে, দু'চারটি হাদীসের কিতাব বা তার অনুবাদ পড়ে যা মনে আসে তাই লিখে 'নামাযের

নববী পদ্ধতি' বলে পেশ করে দেওয়া হয় এবং পাঠকবৃন্দকে এই ধারণা দেওয়া হয় যে, আজ পর্যন্ত ইসলামী মনীষীগণ তোমাদেরকে যে নামায শিক্ষা দিয়েছেন তা নববী নামায নয়। তা- নাউযুবিল্লাহ- অন্য কোন নামায বা ফিকহের নামায; হাদীসের নামায নয়। অথচ ফিকহে ইসলামী কুরআন হাদীসেরই ভাষ্যকার এবং কুরআন হাদীসের বিধানাবলি, রীতিনীতি ও এর বাস্তব নমুনা উপযুক্ত বিন্যাস ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উপস্থাপনকারী; তা কখনোই কুরআন হাদীসের বিপরীত বা এর সাথে সম্পর্কহীন কোন বিষয় নয়।

৪. নামাযে কিছু কাজ এমন রয়েছে, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এটি কয়েক ধরনের যথা ঃ

ক. উভয় পদ্ধতি মাসনূন।

খ. একটি মাসনূন এবং অপরটি বৈধতা বোঝানোর জন্য হয়েছে।

গ. একটি পন্থা প্রথমে ছিল, পরবর্তী সময়ে তা একদম রহিত হয়ে গেছে বা তার সুন্নাত হওয়া রহিত হয়ে শুধু বৈধতা বাকি রয়েছে।

ঘ. একটি পন্থা মাসনূন অপরটি কোন উযরবশত ছিল।

ঙ. একটি পন্থাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, অপরটি যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ এটাকে সহীহ বলেন এবং কেউ এটাকে সহীহ বলেন না।

কখনো এমনও হয় যে, উভয় পন্থার হাদীসসমূহেই মতানৈক্য থাকে। কোন হাদীসবিদ একে সহীহ মনে করেন, আবার কেউ একে যয়ীফ মনে করেন।

এখন পন্থার বিভিন্নতা কোথায় কোন ধরনের- এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া ফিকহের ইমামগণের কাজ। এ জন্য হাদীসের কিছু গ্রন্থাবলি বা এর অনুবাদ পড়ে নেওয়া মোটেও যথেষ্ট নয় এবং এ ক্ষেত্রে এই জিগির

তোলারও কোন সুযোগ নেই যে, অমুক অমুক ফিকহের সংকলিত নামায-পদ্ধতি কিয়াস বা যয়ীফ হাদীস নির্ভর।[৪]

৫. কিছু কাজ এমনও আছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাক্রমে শুধু বৈধতা বোঝানোর জন্য করেছেন; এ জন্য করেননি যে, তা নামাযের কোন মাসনূন বা মুস্তাহাব কাজ। কোন হাদীসে এ ধরনের একটি কাজ দেখে তা সুন্নাত মনে করা মোটেও ঠিক নয়। যেমন জুতো পরা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা এবং নামায আদায় করা। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতো পরে নামায আদায় করেছেন। কোন কোন পাঠক এটা দেখে মনে করেন জুতো পরে নামায পড়া সুন্নাত অথচ আজ পর্যন্ত মৌলভীরা আমাদেরকে এই সুন্নাত থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এখন তাদের একথা বোঝানোর ভার কে নেবে যে, উপরোক্ত হাদীসে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে জুতো পরে নামায পড়ার শুধু বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে। শর্ত হল জুতো পাক হতে হবে এবং এমন সাদাসিধে হতে হবে যে, তা পরিধান করে অতি সহজেই সেজদা করা যায় এবং অঙ্গুলিসমূহ জমির সাথে মিলিয়ে রাখা যায়; যেমন চামড়ার মোজার মধ্যে সম্ভব। কিন্তু উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সর্বাবস্থায় ও সব পরিবেশে সব ধরনের জুতো পায়ে দিয়ে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা বা জুতো পড়ে নামায পড়াকে নবীজীর সুন্নাত তরীকা মনে করা নিতান্তই ভুল এবং উসূলে ফিকহের ব্যাপারে অজ্ঞতার পরিচায়ক।[৫]

---

[৪] ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফাহ বাইনাল মুসলিমীন, রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৬৬; (কুনুতের আলোচনার পূর্বে) ১/২৪২-২৪৪ (আখেরী বৈঠকের আলোচনার পূর্বে) ওলীউল্লাহ দেহলভী হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ৩/৪৩৬-৪৩৭, ইউসুফ লুধিয়ানভী, ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকীম ২য় খণ্ড, আব্দুল্লাহ বিন যাইফুল্লাহ আর রুহাইলী, দাওয়াতুন ইলাস্ সুন্নাহ ফী তাতবীকিস সুন্নাতি মানহাজা ও ওয়া উসলূবা, মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, আসারুল হাদীসিশ শরীফ ফিখতিলাফির আয়িম্মাতিল ফুকাহা, আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসায়িলিল ইলমি ওয়াদ দীন।

[৫] আল আল মাক্কারী, ফাতহুল মুতাআল ফি মাদহি খাইরিন নিআল (গায়াতুল মাকলের উদ্ধৃতিতে) আল-উব্বী, শরহু সহীহ মুসলিম ২/৪৫৮; আস-সানুসী শরহু সহীহ মুসলিম ২/৪৫৮; আবদুল হাই লাখনৌভি, গায়াতুল মাকাল ফীমা ইয়াতাআল্লাকু বিন নিআল; কাশ্মীরি, ফায়যুল বারী ২/২৬; বানুরী, মাআরিফুস সুনান ৪/১-১৭; আল-কাউসারী, মাকালাতুল কাউসারী ১৭০-১৮৭)

৬. বক্ষমান প্রবন্ধে উল্লেখিত নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। হাদীস, আসারে সাহাবা; আমলে মুতাওয়ারাস এবং 'খাইরুল কুরূন' এর ঐক্যমতে এ বিষয়টি প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে মুহাক্কিক আলেমগণ একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন; যাতে এ বিষয়ের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি নিজেও এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি যা নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে 'মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা' থেকে প্রকাশিতব্য গ্রন্থের অংশ হিসেবে অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ